সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০১)

বিভূতিভূষণের তিনটি উপন্যাস : প্রসঙ্গ ব্রাত্যজীবন

নাসরীন আখতার*

সাহিত্য সৃষ্টির কালিক প্রবাহে উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাস্তব জীবনের প্রক্ষেপণে, লেখকের প্রজ্ঞার আলোকে প্রভাসিত এক জীবন অভিজ্ঞানের নন্দন-ভাষ্য উপন্যাস। নির্দিষ্ট সমাজ পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ যখন ঔপন্যাসিকের প্রাণ প্রাচুর্যময় জীবনবোধে অন্বিত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে শিল্পিত প্রজ্ঞায় দীপ্তিমান। উপন্যাসে বিম্বিত দেশ, কাল, ব্যক্তি, সমাজ এক সমগ্রতার উপলব্ধিতে পৌঁছায়। সমকাল, সমাজ, মানুষ সম্পর্কে তীব্র সচেতনতায় একজন লেখক বা ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন সমগ্রের প্রত্যক্ষদর্শী। উপন্যাস সময় এবং মানুষের গতিশীলতা ধারণে বিশ্বস্ত। সেই অর্থে মানব মনের মাটিতে ঔপন্যাসিকের কাজ।

সমাজ ও মানুষকে আশ্রয় করেই ঔপন্যাসিক তার জীবন সম্পর্কিত পূর্ণায়ত ধারণা ও বহুমুখী বোধের জগৎকে ব্যক্ত করেন। সে বহুমুখী বোধের অন্বেষণে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে এসেছে মানুষ, সে মানুষ সাধারণ ব্রাত্যজন। প্রকৃতি ও সমাজের ভারসাম্যতায় অনুপুঙ্খভাবে উচ্চ বর্ণের পাশাপাশি নির্দ্বন্দ্ব আস্থায় প্রবহমান ব্রাত্যজীবন। যেখানে নিরন্তর রূপায়ণই জীবন, বিভূতিভূষণ সে জীবনেরই নিতান্ত নির্মোহ, নিপুণ কারিগর। প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) সাহিত্যিক হিসেবে প্রধানত ঔপন্যাসিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-সাধনা বিবর্ধিত। সাহিত্য মননে এক বিশেষ দিকের প্রবক্তা তিনি। তাঁর রচনার প্রধান গুণ গ্রাম-জীবন সম্পৃক্তি। গ্রামীণ জীবনের আশা-নিরাশা দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের প্রথাগত প্যাটার্ন অতি সরল ও শিল্পশোভন উচ্চারণে তাঁর লেখায় ব্যঞ্জিত। তাঁর অঙ্কিত দারিদ্র্য-কষায়িত জীবনের সাথে শরৎচন্দ্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ ও বস্তুগত পার্থক্য বিদ্যমান। শরৎচন্দ্র যেখানে গ্রামের কূটচক্রী, ষড়যন্ত্রকারী মানুষ চিত্রণে ও নারীমনের গভীরতার আন্তর–বিবিক্ষায় নিমজ্জিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে ধনী-নির্ধনের সংঘাত, অর্থনৈতিক টানাপড়নের বিশৃঙ্খলা, ফ্রয়েডীয় চিন্তা-চেতনায় ইন্দ্রিয় বিপর্যয়ের ধস বিন্যাসে জীবনের চরম বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, বিভূতিভূষণ সেখানে তাঁর স্বপ্নের গ্রামের মানুষের চিত্র এঁকেছেন অত্যন্ত নির্লিপ্তনিষ্ঠায়। তাঁর আবেগসৃষ্ট মানুষ বড়মাপের—বিত্তবৈভবে নয়, চিত্তবৈভবে।

কালের দিক থেকে বিভূতিভূষণের শিল্পিজীবনের শুরু কল্লোলযুগে। অথচ কল্লোলযুগের সমান্তরালবর্তী হয়েও তিনি ছিলেন সে গোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের থেকে অনেক দূরে। এই গোষ্ঠীর লেখকেরা তখন রবীন্দ্র–প্রদর্শিত পথ থেকে সযত্নে নিজেদের সরিয়ে এনে, সমকালের অস্থির জীবন জটিলতার সরু গলিপথে প্রবশে করে রত্ন আহরণে ব্যস্ত।[১] বিভূতিভূষণ সেভাবে

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালীগঞ্জ মাহতাবউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ, ঝিনাইদহ।

রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করেন নি। তাঁর জীবনবোধ রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে এসেছে। বিভূতিভূষণ কল্লোলগোষ্ঠীর আধুনিক জটিল জীবন রহস্যের নবনির্মিত পথকে স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে পিছনে রেখে স্বাভাবিক অতীতচারী রোমান্টিক মানস-সরোবরে আবগাহন করেছেন। এই নান্দনিক রুচির জন্য বিভূতিভূষণ কল্লোলযুগের লেখকদের থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে প্রকৃতির অনুষঙ্গে মানুষের প্রতি ভালবাসায় আন্তরিক। সাহিত্য জগতে *কল্লোল, কালিকলম*কে কেন্দ্র করে যখন চলছে নব্য লেখকদের চটকদারী চিন্তার বিপ্লবাত্মক আন্দোলন, শাণিত মনোবিশ্লেষণে ঝলসে উঠেছে আধুনিক মন-মনন, তখন বিভূতিভূষণের শান্ত প্রকৃতির কোলে আশ্রিত কষ্টসহিষ্ণু মানুষের কাছে ফিরে যাওয়া– এক বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। যদিও রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানবপ্রেম নতুন ছিল না, তবু বিস্ময়কর এই জন্য যে, বিভূতিভূষণের আবির্ভাবকালে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা প্রবলভাবে অন্যখাতে প্রবহমান। একদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্থিতধী প্রতিভা ও কালজয়ী সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে মধ্যগগনে দীপ্যমান। অন্যদিকে, বৈরী সময়ে ক্লিষ্ট চিন্তনে বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত মন সাহিত্যে সামন্ত মূল্যবোধের প্রত্নস্মৃতি বিতাড়নে, চমৎকারভাবে সংগ্রামরত।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে উপজীব্য প্রকৃতি ও মানুষ। সৃষ্টিসম্ভার ও চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় তাঁর সৃষ্ট মানুষ যেন অর্ধেক প্রকৃতি, অর্ধেক মানব। রচনার গদ্যশৈলী কাব্যধর্মী। শব্দসম্ভার মাধুর্যমণ্ডিত, সংগীতময়। উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে অভাবখিন্ন, দরিদ্র্যলাঞ্ছিত গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। উচ্চ বর্ণের দরিদ্র মানুষের অনায়াসলব্ধ জীবন সংগ্রাম, উচ্চ বর্ণ–বিত্তের সামাজিকদের আনুকূল্য বঞ্চিত ব্রাত্যশ্রেণীর প্রবহমান জীবন তাঁর উপন্যাসে অনেকটা সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত। তারাশঙ্করের রুদ্রতা, মানিকের বিজ্ঞানমনস্কতা, প্রেমেন্দ্রের জীবন-তৃষ্ণা বিভূতিভূষণের মধ্যে নেই। কিন্তু এই তিনজনের মতই জীবন এবং মানুষের প্রতি তার অকৃপণ মমতা আছে। শরৎচন্দ্রের রীতিতে এ মমতা অশ্রুক্ষরিত, কিন্তু তা ব্যঙ্গের চাবুকে লিকলিক করে ওঠে না।[২]

এভাবেই সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের আশ্চর্যতর অভ্যুদয়। একেবারে যেন অন্য পৃথিবী থেকে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিলেন তিনি। সংঘাত-সংকুল, সমস্যাময় জগতেও যে জীবনের একটা রহস্যাপ্লুত, আনন্দিত সত্তা আছে, এই আত্মতৃপ্তি এনে দিল বিভূতিভূষণের সাহিত্য। রৌদ্র-দগ্ধ দেহ যেন প্রকৃতির ছায়াশীতল আশ্রয় ও শান্ত সুরের মূর্ছনায় জুড়িয়ে গেল। একথা ঠিক যে,সমকালীন জীবন-সমস্যার কোন রূপায়ণ, একমাত্র *অশনি সংকেত* ছাড়া বিভূতিভূষণের অন্য উপন্যাসে প্রত্যক্ষ নয়। তবু কেবল সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়, হৃদয় ক্ষেত্রেও তিনি স্থির প্রতিষ্ঠিত হলেন তাঁর শিল্পবোধের সাথে অন্বিত তন্ময় শিল্পভাবের দ্যোতনায়।

শিল্পিসত্তার আন্তরক্রিয়া ও অস্তিত্ব অভীপ্সায়, বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে যে জীবন বিভূতিভূষণের উপন্যাসে বিধৃত, তা বহুলাংশে সাধারণ ব্রাত্যজীবন। প্রতীকায়িত ব্রাত্যজীবন, তাদের অবস্থান ও স্বরূপ নির্ণয়ে উচ্চ বর্ণ-বিত্তের মানুষের সাথে সম্পর্কায়নে, প্রথমেই জানা দরকার ব্রাত্যজীবন বলতে কী বোঝায়? বিভূতিভূষণ বর্ণিত ও চিত্রিত ব্রাত্য কারা? সাধারণভাবে 'ব্রত' অর্থ বিধিবিধান বা অনুশাসন। ব্রাত অর্থ জনগোষ্ঠী বা বাহিনী। মুখ্য অর্থে ব্রাত্য বলতে বোঝায় আচরিত বিধিবিধান মান্যকারী সাধারণ জনগোষ্ঠী।[৩] বর্ণবাদী আর্যসমাজে কারা ব্রাত্য পর্যায়ের মিছিলে শামিল, তা জানতে হলে হিন্দুধর্মের বিভাজন প্রেক্ষাপট তুলে ধরা প্রয়োজন।

বর্ণবাদী হিন্দুসমাজে সাধারণ মানুষ অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলে ঘৃণিত। বর্ণ বিভাগ সম্পর্কে স্বয়ং ব্রহ্মার ঘোষণা "চতুর্বর্ণা ময়া সৃষ্টঃ।" গুণ, কর্ম অনুযায়ী ৪টি বিভাগ সেখানে পরিদৃষ্ট। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। চাতুর্বর্ণের এ উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাচীনতম অনুমানটি আছে *ঋগবেদে।* কিন্তু বৈদিক যুগে ধর্মশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে বলা হয়েছে, আদিপুরুষের (ব্রহ্ম) মুখ থেকে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি—বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্র। এখানে সহজ প্রতীতি জন্মে শূদ্রগণও একই উৎসজাত। কিন্তু যেহেতু শূদ্র আদি পুরুষের পা থেকে জাত, সে কারণে ব্রাহ্মণ্য সমাজে, তাদের অবস্থান দাসবৎ।[৪] শূদ্র শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয়কালেও চাতুর্বর্ণের তখনকার অবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যায়। পুরাণের 'ব্রাহ্মণ্য পরম্পরা'তে বলা হয়েছে- "যারা দুঃখ করছিল ও ধেয়ে আসছিল, যারা পরিচর্যায় রত ছিল, যারা নিস্তেজ ও অল্পবীর্য তাদের শূদ্র বলা হল।" শব্দমূলগত ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঋগবেদ ও অথর্ববেদে শূদ্রদের নিতান্ত অবজ্ঞেয়, অশুচি না ভাবলেও ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ঐতিহ্যে তাদের অবস্থান হীন। কারণ, ব্রাহ্মণ শ্রেণী কায়িক শ্রমকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন। ফলে, নীচ ও হীন কাজ যারা করে অর্থাৎ শূদ্ররা অপাংক্তেয়।

আদি পালি রচনায়ও পাঁচটি ঘৃণ্যবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডাল, নিষাদ, বেণ (শিকার ও বাঁশের কাজ করে), রথকার ও পুক্কুস (বন্যজন্তু শিকারী)। এরা প্রত্যেকেই আদিম জনগোষ্ঠী এবং দরিদ্র, হতভাগ্য জীবন যাপনকারী। প্রচলিত কথায় 'চণ্ডাল' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে গুণরহিত, বিশ্বাসহীন ও নীতিহীন। মিলিতভাবে এদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হত। অস্পৃশ্যদের বলা হত, অন্ত্য বা বাহ্য অর্থাৎ গ্রাম বা নগরের বাইরের অধিবাসী। এই অর্থে শূদ্র অন্ত্যজ শ্রেণী, ব্রাত্যজন। সামাজিক অবস্থানে এরা হেয় বলে চিহ্নিত। জায়সবাল দাবি করেছেন যে, শূদ্র বৈরী জনগোষ্ঠীর লোক।[৫] ব্রাত্যরা যেমন ব্রাত, কোন একক জনগোষ্ঠীর সদস্য নয়, বৈরী জনগোষ্ঠীও তেমন। এদের সম্মিলিত সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় বিন্যাস তিনভাবে চিহ্নিত।

প্রাচীন আর্যসমাজের বিন্যাস থেকে বাংলার সমাজ সংগঠন অনেকাংশে পৃথক ছিল। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চাতুর্বর্ণের উপর। বাংলায় প্রতিষ্ঠিত ছিল কৌম সমাজ। সেটা বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের সমাজ।[৬] ফলে, আর্যরা এদের ঘৃণার চোখে দেখতো। কৌমজাতির অন্যতম ছিল পুণ্ড্র, বঙ্গ, কর্বট প্রভৃতি। পুণ্ড্রদের বংশধর পোদজাতি, কর্বটকৌমের কৈবর্ত জাতি, এছাড়া বঙ্গ উৎকলবাসী প্রাচীন বাংলার আর এক জাতি বাগদি। এদের গোত্রীয় হাড়ি, ডোম, বাউড়ি প্রভৃতি। বাগদিরাই রাঢ় বঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। আমাদের সাহিত্যে এদের পূর্বাপর উল্লেখ আছে। বর্ণ বিভাজনে ব্রাহ্মণ বাংলার সমাজে ছিল না। বস্তুত গুপ্তযুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা এসে বাংলা দেশে বসবাস শুরু করে। সমসাময়িক তাম্রপট্টসমূহে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ের লিপিসমূহে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর্য চাতুর্বর্ণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কাজেই, বলা যায় উত্তর ভারতের মতো বর্ণবাচক জাতি হিসাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কোনকালেই বাংলাদেশে ছিল না।[৭]

বাংলাদেশে বর্তমানে যে জাতি বিন্যাস প্রচলিত গুপ্ত বা পাল যুগে তেমন ছিল না। সে যুগে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে কায়স্থ জাতির উদ্ভব হয় নি। অবশ্য *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* জাতির তালিকায় কায়স্থ ও করণ শব্দ দুটি পাওয়া যায়। কায়স্থরা পেশাদারী শ্রেণী হিসাবে গণ্য হত।[৮] নবম ও দশম শতাব্দী থেকে কায়স্থরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করতে শুরু করে এবং গুপ্ত যুগে প্রচলিত ব্রাহ্মণেতর উপাধিসমূহ যেমন- ঘোষ, দত্ত, বোস, মিত্র, মিশ্র, ভদ্র, সেন, বর্মণ, কুণ্ডু, পালিত, নাগ,

দাশ, রুদ্র, বিষ্ণু, গুহ ইত্যাদি পদবি হিসাবে ব্যবহার করে। বর্তমানকালেও এগুলোই প্রচলিত। পালযুগের অনুশাসনে নিম্নকোটির অন্তর্ভুক্ত যে জাতির নাম পাওয়া যায় তা হচ্ছে —— মেদ, অনধ্র ও চণ্ডাল। কিন্তু ৭ম ও ৮ম শতকে রচিত চর্যাসাহিত্যে আমরা যে সকল জাতির উল্লেখ পাই তারা হচ্ছে —— ডোম, চণ্ডাল, শবর, কাপালিক।[৯] বাংলার সামাজিক বিন্যাসে পুনরায় পরিবর্তন আসে সেন রাজাদের আমলে। ব্রাহ্মণদের গাঁই প্রথা তো ছিলই (ভট্ট চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি), উপরন্তু মুখ্য কুলীন, গৌণকুলীন, ভঙ্গকুলীন, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ এ সময়েই বিভাজিত হয়।[১০] তাছাড়া, নিম্নকোটির যেসব জাতির উল্লেখ পাই, তারা ম্লেচ্ছ জাতিসমূহ। যেমন —— পুলিন্দ, যবনল, খর, শবর ইত্যাদি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিন্যাসে চামার, জেলে, মাঝি, ডোম, চাড়াল, বুনো, মুচি, কৈবর্ত, বাগদি ইত্যাদি নিম্নকোটি অর্থাৎ শূদ্র শ্রেণীর মানুষ। ব্রাহ্মণ কর্তৃক এরা ছিল অস্পৃশ্য। এদের না আছে ধর্মীয় আভিজাত্য, না সামাজিক ঐতিহ্য। দৈশিক লোকাচার ও সংস্কৃতির বর্ণ–বৈষম্যে ব্রাত্যজনের মিছিল এভাবে প্রলম্বমান।

উপরিউক্ত সামাজিক ও ধর্মীয় বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে ব্রাত্যজীবন সম্পর্কে ধারণা করা যায়, ব্রাত্যরা বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা বর্ণ-সম্প্রদায় নয়। দৈশিক লোকাচারসমৃদ্ধ বৃহৎ প্রতিবেশের সাধারণ মানুষ। শূদ্র ও অব্রাহ্মণ্য জনমানসের মিলিত প্রকরণে নির্মিত শান্ত, উদাসী অভাবী জীবন। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে রূপায়িত ও বিধৃত ব্রাত্যজীবন বিশেষ কোন বর্ণের একক জনগোষ্ঠী নয়, সামগ্রিকভাবে সাধারণ। নিম্নবর্ণের নিম্ন-বিত্তের অন্ত্যজ শ্রেণী। তারা অস্পৃশ্যতা ও কর্মবিভাগ অনুযায়ী শূদ্র ও অন্যান্য অব্রাহ্মণ্য শ্রেণী থেকে এসেছে।

বিভূতিভূষণের প্রায় সব উপন্যাসে, একমাত্র *আরণ্যক* ব্যতীত, একজন সর্বজয়া ও সহায়হরির উপস্থিতি বিদ্যমান। বর্ণে-উচ্চ অথচ বিত্তে নিঃসহায় এসব মানুষের জীবনাচরণে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য। বর্ণিত সাধারণ মানুষ বা ব্রাত্যজন কোথাও কোথাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে চৈতন্যের মর্মমূল স্পর্শ করেছে। তার উপন্যাসে জটিল জীবন-জিজ্ঞাসা নয়, সূক্ষ্ম জীবনবোধ পরিব্যাপ্ত। *পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯২৯-১৯৩৫) এই ত্রয়ী উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্য জগতে অসামান্য সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা পাবার পর, একটু ভিন্নধর্মী ও অভাবনীয় নতুন রূপে রচনা করেন চতুর্থ উপন্যাস *আরণ্যক* (১৯৩৯)। গ্রন্থভূমিকায় ঔপন্যাসিক আভাস দিয়েছেন—— "আরণ্যক-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ অরণ্য-প্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে।"

উপন্যাসের শুরুতে আভাসিত *আরণ্যক*-এর রচনা প্রয়াস। দিগন্ত-বিস্তারী বন্য প্রকৃতির আদিম সৌন্দর্য যেন সভ্যতার নামে তারই হাতে নিষ্পিষ্ট। সেই পাপক্ষালনের সত্যভাষণই এ উপন্যাসের আনুক্রমিক বিন্যাস। *আরণ্যক* বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত সৃষ্টি। কাহিনীর মৌল ও অন্তর্গূঢ় আলেখ্য নিবিড় বেদনাবাহী। আদি, মধ্য, অন্ত্য——নানামাত্রিক বিশ্লেষণে উপর্যুক্ত তথ্য সমর্থিত। তাঁর শিল্পিমানস পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও সমাজ শৃঙ্খল প্রতিবেশে নিজেকে অন্বিতকরণে পারদর্শী।

আরণ্যক উপন্যাসে গল্পকথক সত্যচরণ প্রধান চরিত্রোচিত মূল প্রেক্ষণবিন্দুতে থেকে, প্রথমে অরণ্য ও পরে অরণ্যের আত্মা মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। ভূমিসংলগ্ন গাঙ্গোতা, তাদের শোষণ–বঞ্চনা, প্রবাহিত জীবনধারা ও মনুষ্যত্বের প্রকাশ অপ্রত্যক্ষ থাকলেও তা সত্যচরণের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সত্যচরণ বিভূতিভূষণেরই অভিন্ন সত্তা। স্রষ্টার মতই সে উচ্চশিক্ষিত,

নিসর্গতন্ময়, উদারহৃদয়, মানবপ্রেমিক, সরলতামুগ্ধ, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী, স্মৃতি অনুধ্যানী, ইতিহাস–ভূতত্ত্ব ও জ্যেতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী। প্রকৃতির শিল্পবিস্ময়ে mystic অনুভবে অভিভূত।[১১]

উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ প্রথমত প্রকৃতিপ্রেমিক নন, দারিদ্র্যের চাপে, অর্থনৈতিক সংকট এড়াতে তার প্রকৃতিবাস। বিহারের ভাগলপুরের কাছে আজমাবাদ লবটুলিয়া বইহারের বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল, মহালেখারূপের পাহাড়, আর অরণ্যসন্তানদের নিয়ে লেখা ধ্রুপদী গম্ভীর, রাগিণীর উপন্যাসটি প্রচলিত ধারার উপন্যাস নয়। নিসর্গ-প্রেমিক বিভূতিভূষণের প্রকৃতি নানারূপে আবির্ভূত হয়ে সংলগ্ন মানুষগুলোর সাথে অন্তর্লীন হয়ে আছে। *আরণ্যক* অরণ্যের প্রেক্ষাপটে কিছু দরিদ্র মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রামের কাহিনী। হতদরিদ্র মানুষগুলোর বেঁচে থাকার প্রেরণা, কঠিন পরিশ্রম, মমতা, আনন্দ, সহমর্মিতা, জীবনের প্রতি ভালবাসা সবই আরণ্যক প্রতিবেশে অন্বিষ্ট। ঔপন্যাসিকের স্বীকারোক্তি–"শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।" (*আরণ্যক*, প্রস্তাবনা, পৃ ৭)। সত্যিই, ঔপন্যাসিক দেহাতী, গাঙ্গোতা কাটনী-মজুর বৃদ্ধ নকছেদী, তার স্ত্রী তুলসী, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা মঞ্চী, কন্যাদ্বয় ছুরতিয়া–ছনিয়াকে নিকট পর্যবেক্ষণে দেখেছেন। তাছাড়া, দরিদ্র বাঙালি ডাক্তারের দেহাতী বনে যাওয়া অনূঢ়া কন্যা ধ্রুবা, প্রকৃত শিল্পী নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া, দরিদ্র নট দশরথ, শিবভক্ত দ্রোণ মাহাতো, মহিষের রাখাল গণুমাহাতো, দুষ্ট ক্ষতে কাতর গিরধারীলাল এবং নাম না জানা কত গাঙ্গোতা প্রজা ও কাটনী মজুরের দল দেখেছেন। অন্যদিকে, দৃষ্টি দিগন্তে ছায়া ফেলেছে — বহুদর্শী মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী, সিপাহী মুনেশ্বর সিং, টিন্ডেল ছট্টুলাল, অতিথিবৎসল সাঁওতাল বীর দোবরু পান্না, রাজকন্যা ভানুমতি, বাইজি কন্যা মোছাম্মাৎ কুন্তা, প্রকৃতি-পাগল যুগলপ্রসাদ, পরোপকারী রাজু পাড়ে, ভিখারি স্কুলমাস্টার গনোরী তেওয়ারী আত্মভোলা মহাজন ধাওতাল সাহু, আরো অনেকে। অরণ্য আর এই মানুষগুলোর জীবন নিয়েই *আরণ্যক* উপন্যাসের পরিকল্পনা। বিভূতিভূষণের মনে ইচ্ছা জেগেছিল — "এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো। একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্যজীবনের ছবি।"[১২] সেই ব্রাত্যজীবনই বিচিত্র আঙ্গিকে ও মহিমায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে *আরণ্যক* উপন্যাসে। বাহার, বনঝাউয়ের ও শিউলির পর্যাপ্ত জঙ্গল সবকিছুর কাব্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি বন্য, দরিদ্র, অসংস্কৃত জীবনের প্রাণময় আবেগসিক্ত প্রাচুর্য কোন অংশে অবহেলার নয়।

আধুনিক লোকাচার ও সংস্কারে যে সমাজ আবর্তিত, সে সমাজের ব্রাত্যজীবনের সাথে *আরণ্যকের* ব্রাত্যজীবন অর্থাৎ গাঙ্গোতাদের পার্থক্য কালিক নয়, স্থানিক অনুবলয়ের। অভাব-তাড়িত মানুষের কষ্ট, লাঞ্ছনা, অস্পৃশ্যতা একই অনুভূতিতে ব্যক্ত। *আরণ্যকে* প্রতিফলিত ব্রাত্যজীবন মূলত গাঙ্গোতা ও দোসাদদের কাহিনী। দরিদ্র গাঙ্গোতা জাতির উপজীবিকা কৃষিকাজ ও পশুপালন। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলে প্রকৃতি তাদের বেঁচে থাকার যে উপাদান দেয়, তা যৎসামান্য। মকাই, কলাইয়ের ছাতু, চীনাঘাসের বীজ, খেড়ী সিদ্ধ, জঙ্গলে জন্মানো বাথুয়া শাক, বন্যফুল, গুড়মী ফল তাদের খাদ্য। গাঙ্গোতাদের জীবন মহাজন–নির্ভর। দেবী সিং-এর মৃত্যুর পর রাজপুত রাসবিহারী সিং তার লাঠির জোরে গাঙ্গোতাদের দমন করেছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় মহাজনের স্বরূপ প্রকাশিত: "গরীবকে মারিয়া তাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার কড়া শাসন ও অত্যাচারে কাহারও টু শব্দ করিবার যো নাই।" (*আরণ্যক*, ৭ম পরিচ্ছেদ, পৃ ৫২)। শাসক মহাজনের গোয়ালে গরু–মহিষ ঘোড়া, অস্ত্রাগারে বল্লম, বর্শা, ঢাল সড়কি, জোয়ান পুত্র, ভাড়াটে লাঠিয়াল, পর্যাপ্ত ফসল সব মিলিয়ে

প্রমাণ করে তার বর্বর প্রাচুর্য ও বন্য দাপট। মনিবের কখন কী মনান্তর ঘটে, সে ভয়ে গাঙ্গোতা প্রজাগণ সবসময় তটস্থ থাকে। আবার, মনিবের আহ্বানে উঠানে পাতা পেতে দই ও চীনা ঘাসের ভাজা দানার ভোজ মহানন্দে খেতেও তাদের উৎসাহের শেষ নেই। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই নিরীহ সম্বলহীন গাঙ্গোতাদের বৈরী। গাঙ্গোতাদের সামাজিক জীবনের এই ভয়ংকর রূপ ঔপন্যাসিক জাগ্রত চেতনায় বস্তুমুখী নিরীক্ষণে তুলে ধরেছেন।

বিভূতিভূষণ সমাজ পরিবেশ থেকে উঠে আসা বেদনাকে ধারণ করেছেন অবহেলিত এবং অন্ত্যজ গাঙ্গোতাদের জীবনচিত্রের মাধ্যমে। নাড়া বইহারে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিল ধূর্ত, কৌশলী ছটু সিং। গরিব গাঙ্গোতাদের ফসলের অধিকার শক্তিমত্তায় সে বঞ্চিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। দিগন্ত-বিস্তারী সরিষার হলুদ সৌন্দর্য লোভের আগুনে পুড়ে দাঙ্গায় পরিণত হয়। কাছারির সহায়তায় সাময়িক উত্তেজনা কমলেও ছটু সিং–এর আক্রোশ কমে নি। লাঠিয়াল হেকে বলেছ — "হুজুর, সরে যান আপনি আমরা একবার এই বাঁদীর বাচ্চা গাঙ্গোতাদের দেখে নিই।" (*আরণ্যক*, ৯ম পরিচ্ছেদ, পৃ ৭২) প্রবলের অত্যাচারে এভাবে নিগৃহীত গাঙ্গোতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো সত্যচরণের সহৃদয় সহযোগিতা না থাকলে। *আরণ্যক*-এ ব্রাত্য গাঙ্গোতা মানবিক শুশ্রূষায় তাদের মর্যাদা ও অধিকার লাভ করেছে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সব দিক থেকেই নিপীড়নের·শিকার গাঙ্গোতা জাত। ছোট জাত বলে তাদের নেই কোন সামাজিক মর্যাদা, ধর্মীয় অধিকার। তবু, দুই/একটি চরিত্রে, ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে এরা উচ্চমার্গের নয়। কাটনী মজুর নকছেদীর দ্বিতীয় স্ত্রী মঞ্চী এমনি এক চরিত্র, একটু আলাদা, স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত। তার দেহাতী 'ছিকাছিকি' ভাষায় গল্প বলার ঢং সত্যচরণের মনোযোগ কেড়েছে। তার আতিথ্য গ্রহণ করে চলে আসার সময় সত্যচরণের মনে হয়েছে—"মঞ্চী যেন আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সারল্যের প্রতিমূর্তি।" (*আরণ্যক*, ১৩ পরিচ্ছেদ, পৃ ১০৩)। মঞ্চীর জীবনেরই একটা ঘটনা ব্রাত্যদের সামাজিক ব্যবধানের বেদনাময়তা সৃষ্টি করেছে। আমলাতলী পাহাড়ের নিচে কলাই কাটার সময় মঞ্চীর বাসনা জাগে সূরয কুণ্ডের গরম জলে স্নান করার। মনের আনন্দে কুণ্ডের জলে নামতে গিয়ে সে পাণ্ডাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এখানে সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের আদিম নগ্নতা ফুটে উঠেছে পাণ্ডাদের উক্তিতে : "গাঙ্গোতীনকে আমরা নাইতে দিইনে কুণ্ডের জলে, চলে যা।" (১৩ পরিচ্ছেদ, পৃ ১০৩)। পাহাড়ী ঝরনার জলে সবার অধিকার অবারিত। কাজেই, পাণ্ডাদের এ সংকীর্ণতা মঞ্চী মেনে নিতে পারে না। স্পষ্ট দ্রোহ চেতনায় তর্কে প্রবৃত্ত হয়। ফলে, পাণ্ডাদের হাতে সে নির্যাতিত, নিগৃহীত। তার অপরাধ সে গাঙ্গোতা। এই হীন লড়াই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। প্রতিবাদ আছে, প্রতিরোধ আছে কিন্তু প্রতিকার নেই। *আরণ্যক*-এর ব্রাত্যরা দারিদ্র্য সীমার অনেক নিচে থেকে মুখ বাড়িয়ে এই ভণ্ড সমাজের চরিত্রকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।[১৩]

মঞ্চী চরিত্র তার স্বভাবধর্মের অনুপুঙ্খ প্রকরণে সজ্জিত। হিংলাজের মালা, স্নো-পাউডার, সৌখিন দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ তাকে আরো দূরবর্তী নেশায় কেন্দ্রচ্যুত করেছে। এ সমাজের পেষণকে স্বাভাবিকতায় গ্রহণ করে নি। অপমানিত মঞ্চীর অসহায় কান্না, বৃদ্ধ স্বামীর সংসর্গে সমাজ

সংসারের প্রতি ঘরছাড়া মঞ্চীর ঘৃণা, তার নারী অহংচেতনা সবকিছুকে বিভূতিভূষণ হৃদয়ের গভীরে ধারণ করেছেন। তাই গাঙ্গোতীন মঞ্চীকে সত্যচরণ সহানুভূতির সাথে মনে রেখেছে।

সমাজের অবহেলা সবচেয়ে বেশি দোসাদদের ক্ষেতে। পুণ্যাহের আয়োজনে সত্যচরণ আশপাশের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। বৃষ্টির ভেতর দূর-দুরান্ত থেকে এসেছিল মানুষ। খাদ্যের মধ্যে ছিল চীনাঘাসের দানা, টক দৈ ভেলিগুড় ও লাড্ডু। বিকালের দিকে হঠাৎ সত্যচরণের দৃষ্টিতে পড়ে, ঘোর বৃষ্টির মধ্যে দুটি স্ত্রীলোক ছোট ছোট বাচ্চাসহ, পাতে চীনা ঘাসের দানা নিয়ে উঠানে বসে আছে। কেউ তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছে না। তাদের নৈঃসঙ্গ্য নির্লিপ্ত উপস্থিতি নীরবে যেন জানিয়ে দিচ্ছে "আমরা ব্রাত্যজন, অচ্ছুত।" এদের ঘরের দাওয়ায় তুললে, ঘরের জিনিস সব অচ্ছুত হবে, অন্য জাতি এখানে খাবে না। বিভূতিভূষণের সত্যাশ্রয়ী মন তা মেনে নেয় নি। সমাজ-ধর্মের চোখে যারা হীন, বিভূতিভূষণের সযত্ন পরিচর্যায় তারা অনেক উপরে ঠাঁই পেয়েছে। তারাও সুন্দর পৃথিবীর অধিকারী।

বিভূতিভূষণ অধীত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রীভূত করে সৃষ্টি করেছেন *আরণ্যকের* নারী চরিত্র। গাঙ্গোতা না হয়েও সমাজ যাকে সমশ্রেণীতে নামিয়েছে, তেমনি এক চরিত্র কুন্তা। পূর্নিয়ার মহাজন দেবী সিং-এর স্ত্রী বাইজি-কন্যা কুন্তা পৌরস্ত্রী না হলেও রূপবতী, মহীয়সী। দেবী সিংকে ভালবেসে সে কাশীর বাস ছেড়েছিল একদিন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর উদ্ভূত জাতি সমস্যায় রাজপুত সমাজে সে স্থান পায় নি। ব্রাত্যজীবনে মিশে যাওয়া দরিদ্র, নিঃস্ব উন্মুলিত কুন্তা এক অসহায় জীবন সংগ্রামী। "যে কুন্তা একসময় লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর দেওয়া পালকী চেপে কুশী ও কলবলিয়া সংগমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী খেয়ে জল খেত, সে ফসল কাটা ক্ষেতে পড়ে থাকা গমের শীষ কুড়িয়ে বন্য কুল পেড়ে কোন রকমে আধপেটা খাইয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে।" (*আরণ্যক*, ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃ ৩২)। আত্মমর্যাদাবান কুন্তার কাছে, সত্যচরণ রাজার প্রতিনিধি। এই দাবিতে সে প্রতিদিন হাড়কাঁপানো শীতে, হিমবর্ষী আকাশের তলায় লবটুলিয়া কাছারিতে দাঁড়িয়ে থাকে, ম্যানেজারের পাতের উচ্ছিষ্ট নিয়ে তার ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর জন্য।

ব্রাত্যজীবনের সংগ্রামশীলতা ও উচ্চ বর্ণ–বিত্তের ঘৃণা নিয়ে জীবন-পথের পদাতিক কুন্তা শত প্রলোভনে তার শুচিতা হারায় নি। দেবী সিং-এর জ্ঞাতি রাসবিহারীর অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কুন্তা তার সাহায্য অগ্রাহ্য করেছে। কুন্তার সতীত্ব রক্ষার আর্তি ঝরে পড়েছে– "মেরে ফেল বাবুজী, জান দেগা–ধরম দেগা নেহিন।" (ষোড়শ পরিচ্ছেদ, পৃ ১৩০)। কুন্তা আশ্রয় নিয়েছে ঝল্লুটোলার এক গাঙ্গোতার বাড়িতে। মৃত স্বামীর প্রতি ভালবাসার দায়বদ্ধতা কুন্তাকে করেছে মহিমাময়ী। স্বজাতি, স্বদেশ থেকে উন্মুলিত কুন্তাকে বিনা সেলামিতে সত্যচরণ পুনর্বাসিত করলে সে আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ে। পদে পদে অপমানিত কুন্তা ভুলেই গিয়েছিল বৈরী পৃথিবীতে সহানুভূতির পরশ। সেবা-ধর্মে পরম ভক্তিমতী কুন্তা, অসুস্থ গিরধারীলালের সেবার ভার নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। এক কালের রাজপুত মহিষী কুন্তা আপন করে নিয়েছে আরেক অসহায় প্রাণ গিরধারীলালকে বাবা ডেকে। সাহস ও পবিত্রতায় কুন্তা চরিত্রের আবেদন নিবিড় আবেগসঞ্চারী। কুন্তা প্রেমে মহীয়ান, সতীত্ব ও নারীত্বের অহংবোধে চির বিজয়িনী। কৃতজ্ঞতা ও আত্মসম্মান বোধ কুন্তা চরিত্রে অলংকার।

বন্য, ব্রাত্যজীবনের মৌল প্রেরণায় বিভূতিভূষণের সৃষ্টি নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া আর এক বিস্ময়। আত্যন্তিক প্রত্যাশায় তরুণ শিল্পীর গূঢ় ও ঐকান্তিক শিল্প তৃষ্ণার আকুলতা দৃশ্যমান তার ছক্করবাজির নাচ শিক্ষার মধ্যে। গাঙ্গোতা হলেও সত্যিকার শিল্পীর নিস্পৃহতা বালক বয়সেই ধাতুরিয়াকে

চারিত্র্যগত ভিন্নমাত্রা দান করেছে। সভ্যজগৎ থেকে, দূরে আরণ্যক পরিবেশে ধাতুরিয়ার মতো শিল্পী সর্বাংশে বিরল। নৃত্য শিল্পী সম্পর্কে শুধু আবেগময় ভালবাসা নয়, অধীত বিদ্যাকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর অফুরন্ত উদ্যম নাটুয়া বালক ধাতুরিয়াকে কলকাতা যেতে প্রাণিত করেছে। অশিক্ষিত, অসংস্কৃত ব্রাত্যশ্রেণীর মধ্যেও যে নান্দনিক শিল্পবোধ থাকতে পারে বিভূতিভূষণ এ চরিত্রের মধ্য দিয়ে সে বোধের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। চরিত্রটিতে মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজ প্রতিবেশ পরিবেশের বাইরে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাশা ব্যক্ত হয়েছে। তাই ধাতুরিয়ার আবেদন—"হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন ? কখনো কলকাতায় যাই নি, শুনেছি সেখানে গাওনা, বাজনা নাচের বড় আদর।" (৭ম পরিচ্ছেদ, পৃ ৫৫)। পূর্নিয়ার হো হো নাচ, ননীচোরা নাটুয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তার সাবলীল জ্ঞান অবাক করে দেয়। ধাতুরিয়ার মনে সবসময় একটা অতৃপ্তি বোধ কাজ করেছে, যা শিল্পীর মানস-চিন্তন প্রক্রিয়াজাত। এই আনন্দিত বালকের হঠাৎ মৃত্যু-ঘটনা আমাদের চৈতন্যে আঘাত করে। বিভূতিভূষণ এ চরিত্রটিতে এক ধরনের সম্পূর্ণতা আরোপ করেছেন- "সেই বন্য অঞ্চলে দুবছর কাটাইবার সময় যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম তার মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার মধ্যে যে একটি নির্লোভ, সদাচঞ্চল, সদানন্দ অবৈষয়িক খাঁটি শিল্পী মনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশে কেন, সভ্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়।" (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, পৃ ১২১) গাঙ্গোতাদের ধর্মীয় পূজা-অর্চনার নেই কোন অধিকার। তবু তাদের সে চেনার মাহাত্ম্য উজ্জ্বল হয়ে আছে বৃদ্ধ গাঙ্গোতা দ্রোণ মাহাতোর শিবভক্তির মধ্যে। লবটুলিয়ার কাছারিতে এসে সে একবার হনুমানজীর ধ্বজার নিচে একখণ্ড শিলা–পাথর লক্ষ করে। এই পাথরখানি ছিল দ্রোণ মাহাতোর কাছে শিব-সমান। ভক্তিতে সে ভগবান গড়েছে। গাঙ্গোতা হলেও সে বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। সত্যচরণ তার ধর্মীয় অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করেছে। ব্রাহ্মণ মটুকনাথ পণ্ডিতের জাত্যাভিমান দ্রোণ মাহাতোর পূজার অধিকারকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু তাতে নীচু জাতের অগৌরবে ব্রাত্য দ্রোণ মাহাতোর ধর্মীয় অনুভূতি ম্লান হয় নি। তেমনি গনু মাহাতোর মহিষ, দেবতা টাড়বারো কাহিনী, জীবন্ত পাথর, বনের আলৌকিক কাহিনী বর্ণনার নৈপুণ্যে মনে হয়েছে সবই তার অভিজ্ঞতা লব্ধ। বোমাইবুরুর জঙ্গলে ডামাবানুর উৎপাত, রহস্যজনক মৃত্যু, সব মিলিয়ে ব্রাত্যজীবনের বিশ্বাসপ্রবণতা প্রতিপন্ন করেছে। এভাবে *আরণ্যক* উপন্যাসে বিন্যস্ত ব্রাত্যজীবন বৃহৎ অরণ্যের মতো ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের সমগ্রতায় ব্যাপ্ত। মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সংকট ইত্যাদির আবর্তন–বিমোচন, চারিত্র্যগত সমতার নৈপুণ্যে মনোজগতে নান্দনিক আনন্দ রস পরিবেশন করে।

বিভূতিভূষণের উপন্যাস *ইছামতী* (১৯৫০)তে তাঁর মানসলোকের সম্পূর্ণ-উন্মোচন উৎসারিত। উপন্যাসের মৌল-বক্তব্য বিষয়–সম্পদ, কাহিনী সমাবেশ, বর্ণিত চরিত্র ভিত্তিকে উপস্থাপন, আর্থ–সমাজিক–ধর্মীয় বিন্যাসে শোষণ চিত্র প্রকরণ, সমস্তই প্রত্যক্ষ বাস্তব। নদী সন্নিহিত পল্লি প্রকৃতির কোলে লালিত সাধারণ মানুষের আচরিত জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ইতিকথা *ইছামতী*। মহাকালের কোলে স্থাপিত এ ইতিকথা স্বপ্নকুহেলী, মোহাচ্ছন্ন। অমৃতধারা বাহিনী, কলস্বনা ইছামতীর তীরে, বনগাঁ, বারাকপুরে কেটেছিল বিভূতিভূষণের বাল্য ও কৈশোর। *ইছামতী* যেন তার মাতৃঋণ পরিশোধ।[14]

ইছামতীর গা ছুয়ে যাওয়া গ্রাম মোল্লাহাটী। বিভূতিভূষণের *দিনলিপিতে* মোল্লাহাটীর মুগ্ধকর বর্ণনা আমরা পাই। গ্রামে সাহেবদের কুঠি আছে, হিন্দু-মুসলিম মিলিত বাস। একদিকে ব্রাহ্মণ শ্রেণী—রাজারামের মতো স্বার্থান্বেষী, অভাবে স্বভাব নষ্ট নীলমণি সমাদ্দার, সত্যসন্ধ রামকানাই কবিরাজ, নিরাসক্ত গৃহী ভবানী বাড়ুয্যে। অপরদিকে, কর্মউদ্দীপ্ত ভক্তপ্রাণ সহজ সরল ব্রাত্যজীবন। ভাগ্যের সাথে যুদ্ধরত পরিশ্রমী যুবকের (নালুপাল) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী, সতীশ কলু, নফর মুচি, দীনু বুড়ি, হরিঁ নাপিত, হলা পেকে, গয়া মেম প্রভৃতি দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, ভাগ্যের হাতে অসহায় কুশীলব। কাহিনীর মৌল বিষয় দীর্ঘ। অসংখ্য নর-নারী তাদের জীবনের উত্থান-পতন, বিচিত্র জীবন-প্রণালী, সাফল্য, ব্যর্থতা বহুমাত্রিকে মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ইছামতী উপন্যাসে বিন্যস্ত ব্রাত্যজীবন কোথাও কোথাও ঘূর্ণায়মান আবর্ত সৃষ্টি করেছে। চন্দ্র চাটুজ্জের ভাগ্নে কুলীন ব্রাহ্মণ ভবানী বাড়ুয্যেকে মূল রশ্মিতে রেখে বিভূতিভূষণ কৌণিক দৃষ্টিতে, ভিন্ন প্রেক্ষণে জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন। ভবানীর মধ্যে, সঞ্চারিত অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী, মানুষ দেখেছে বর্ণ-বিত্তের সীমায়িত গণ্ডিতে নয়, বর্ণ-আভিজাত্যের বাইরে নির্মোহ দৃষ্টিতে। উপন্যাসটিতে ১২৭০ সালের কাহিনী বিবৃত। তখন বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য কৌলীন্যপ্রথা সরবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছে। সমাজ ও ধর্মীয় আবর্তে নানা শোষণের শিকার অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য শ্রেণী। এমনই এক প্রেক্ষাপটে রচিত *ইছামতী* উপন্যাস। এতে মন্বন্তর নেই, বন্যা-মারী নেই, আছে পূর্বাপর দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়, পরিশ্রমী অন্ত্যজ শ্রেণী, নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী। ঔপন্যাসিকের পরিণত জীবনদর্শন ইঙ্গিতবাহী।

উপন্যাসে উচ্চ ও নীচ বর্ণের সামাজিক দূরত্ব চিহ্নিত। বিভূতিভূষণ তার চিত্রণে ব্রাত্যজীবনকে মার্জিত করেছেন। কিছু ব্রাত্য প্রোজ্জ্বল শোভায় দৃশ্যমান। কাউরা তিনকড়ি, দেওয়ান রাজারামকে সরিষার তেল উপঢৌকন হিসাবে দিতে চায়। বর্ণবৈষম্যে কাউরা বাংলাদেশে অস্পৃশ্য শূদ্র, শূকর রক্ষক। কাউরার দেওয়া সরিষার তেল, তা যতই শ্রদ্ধাজ্ঞাপক হোক, বিনামূল্যে রাজারাম গ্রহণ করে নি এই অজুহাতে—"শুদ্দুরের দান নিতি নেই আমাদের বংশে।" (*ইছামতী*, পৃ ২৩)। রাজারামের বাস্তবমনস্ক জীবনবোধে জাতিভেদ অতিক্রমিত নয়। কিন্তু বিত্তে সফল, তিনকড়ির প্রতি অচ্ছুতের ঘৃণা নেই। বরং খাতির যত্নই করেছে নিতান্ত আত্মীয়ের মতো। তিনকড়ি চরিত্রের পরিচর্যায় যে সংকট প্রকট, তা প্রথমত সামাজিক ব্যবধান। দ্বিতীয়ত বর্ণিত কাহিনী-আলেখ্যে ধর্মীয় সংস্কার। এ সবকিছু সামনে এনেছে বিভূতিভূষণের চারিত্র্য মার্জনা। নিষ্ঠা ও সাধনায় ধর্মের ভক্তিমার্গে পৌঁছানোর অধিকার রূপায়িত খেপী সন্ন্যাসিনী চরিত্রে। গ্রামের প্রান্তে বাওড়ের ধারে, বটবৃক্ষের নিচে সন্ন্যাসিনীর আশ্রম। জাতে হাড়ি-ডোম। বর্ণ বিভাজনে অতি অচ্ছুত। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনায় অন্তর সম্পদে সমৃদ্ধ। ব্রাত্যজীবনের শৃঙ্খল ছেড়ে আত্মিক জীবনে পদার্পণ অসাধারণ প্রথাযুক্তির সমর্থক। সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাভাজন সন্ন্যাসিনী ভবানী বাড়ুয্যের অধ্যাত্ম ভাবনার সঙ্গী। ভবানীর মননশীলতায় অজ্ঞ ডোম-সন্ন্যাসিনীর আগ্রহাতিশয্যে ব্রাহ্মণ ভবানী বাড়ুয্যে তাকে আসনসিদ্ধি দেখিয়ে দেওয়ার সদিচ্ছা ব্যক্ত করে। "আমি আসবো সামনের অমাবস্যেতে, দেখিয়ে দেব প্রণালীটা" (*ইছামতী*, পৃ ৩৬)। বিভূতিভূষণের ব্রাত্যজীবন বর্ণ-আভিজাত্যের সামাজিক-ধর্মীয় প্রবাহে সমান্তরাল, কলুষহীন।

উনিশ শতকের যে সামাজিক বিন্যাস এ উপন্যাসে প্রতীকায়িত, সেখানে বাস্তব প্রেক্ষাপটে বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার ছিল নিম্নবর্ণ ব্রাত্য শ্রেণী। নির্জিত ব্রাত্য বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে বীরত্বে বীর্যবান। দেওয়ান রাজারামের ইঙ্গিতে পাঁচপোতার বাওড়ে বাগদিদের

মোড়ল রাম সর্দার নিহত হলে, পুত্র হারু ও শ্যালক নারানের নেতৃত্বে বাগদিরা সংগঠিত হয় প্রতিশোধস্পৃহায়। ফলে দুর্দান্ত দেওয়ান নিহত হল ষষ্ঠীতলার মাঠে। অপরদিকে, প্রচ্ছন্ন নীল বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠল ক্ষীণ প্রাণ ভীত-সন্ত্রস্ত চাষী সম্প্রদায়ের মনে। প্রকৃতির বুকে ফলিত ফসলের সম্ভার হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হলো নীলকরের চক্রান্তে। শক্তিমান নীলকরের লাঠিয়ালের ভয়ে অনেকাংশে সমর্থনহীন নীল বিরোধিতা সংঘবদ্ধ। লভ মেয়ো ও দেওয়ান রাজারাম নিহত হওয়ার মধ্যে শ্বাপদ আক্রোশে হতদরিদ্রের শ্রেণী সংগ্রাম প্রবাহিত। প্রত্যক্ষ বাস্তবতার দৃষ্টিপ্রেক্ষণে নির্ণীত আশাহত, বেদনাবিদ্ধ ও প্রতিবাদমুখর ব্রাত্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। বিভূতিভূষণ চিত্রিত ব্যাত্যজীবন সমাজে হেয়, একপেশে নয়। ভবানী বাড়ুয্যের মনে একই সারিতে স্থান পাওয়া দুর্ধর্ষ ডাকাত হলধর ওরফে হলা পেকে এক অদ্ভুত চরিত্র। চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যে অতি নীচ, হীন হওয়া সত্ত্বেও তার মানবিক দিকগুলো ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি এড়ায় নি। মানুষের মন যে কত বিবর্তনমুখী তা এই হলা পেকে চরিত্রের অস্তিত্বে বিদ্যমান। বহু মাথা-কাটা খুনের নায়ক হলা ডাকাত জ্ঞানত কোন ব্রাহ্মণকে অসম্মান করে না। দেব-দ্বিজে অগাধ ভক্তি। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভবানীকে, সন্ন্যাসী চৈতন্য ভারতীকে। নিছক খুনী, পাপী বলে তাকে ঘৃণা করা যায় না। ভবানীর কথায় সংশয়— " এই হলা পেকে খারাপ লোক, খুন রাহাজানি করে বেড়ায় কিন্তু এর মধ্যেও সেই তিনি।" (*ইছামতী*, পৃ. ১৬৮)। দুর্দান্ত ডাকাত বুক উঁচু করে স্বাভাবিকতায় বর্ণনা করে লোমহর্ষক খুন ডাকাতির কাহিনী। ব্রাহ্মণ সমাজ যার ভয়ে কাঁপে রণ পা চড়িয়ে যে সঙ্গী অঘোর মুচিকে নিয়ে একরাতে বিশ ক্রোশ পথ পাড়ি দেয়, ডাকাতি করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়লে মুখে যে ঝম্প বাজিয়ে এমন শব্দ করে যাতে "মেয়েমানুষের পেটের ছেলে পড়ে যায়" (*ইছামতী*, পৃ. ১১১), সেই দুর্দান্ত দস্যুকে তিলু ও তার ছেলে খোকা বশ করেছে ভালবাসার যাদুতে। কোন অজ্ঞাত কারণে খোকার সামনে সে শান্ত, সুবোধ হয়ে যায় তা অবিশ্বাস্য। লুঠ করে সম্পদ আনতে তার বাধে না, আবার লুঠের অলংকারে অমিত উচ্ছ্বাসে খোকাকে নিঃস্বার্থে সাজাতে তার কত ব্যাকুলতা। এখানে হলা পেকে চরিত্রের দ্বৈতসত্তার বিরোধ স্পষ্ট। পাষাণে প্রবাহিত ফল্গুধারার মতো তার হৃদয়ে স্নেহের প্রস্রবণ আত্মচেতনাক্ষরণে প্রবাহিত। ভালবেসে খোকার হাতে সোনার বালা পরাতে চাইলে, সংগত কারণে তিলু–ভবানী আপত্তি করে। এখানে সে মানসিক আঘাতে আপ্লুত–"এবার না নিলি মোর মনে কষ্ট হবে না দিদিমনি ?" (*ইছামতী*, পৃ ১০৯)। তার স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয়ের উন্মোচন ঘটেছে এ উক্তিতে।

হলা পেকের চারিত্র্যগত বৈপরীত্য তাকে আরো রহস্যময় করে তোলে তিলু-নীলুদের সাহচর্যে। তিলু-নীলুর কাছে সে একান্ত বাধ্য স্নেহকাঙাল দাদা, খোকাঠাকুরের ভালবাসার মামা, কিন্তু যে বাড়িতে ডাকাতি করে তাদের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা। একদিকে ভক্তিমান, অন্যদিকে সংহারক। প্রায়-বৃদ্ধ বয়সেও ডাকাতি ছাড়ে নি সে। একদিন রামকানাই পণ্ডিতের বাড়ি থেকে পাঁচপোতা গ্রামে ফেরার পথে ভবানী, তিলু, নিস্তারিনী ও খোকা সন্ধ্যার আবছা আলোয় জনৈক লোককে ছুটে আসতে দেখে আতঙ্কিত হয়। "লোকটার হাতে লাঠি, সকলেরই ভয় হয়েছে লোকটার গতিক দেখে।" (*ইছামতী*, পৃ ১৬৭)। চুল পেকে গিয়েছে। তবু চিনতে দেরি হয় না তিলুর। স্বভাব তার একটুও বদলায় নি। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। জেল থেকে ফিরে আবার সে ডাকাতি শুরু করেছে। তিলু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়—"হলা দাদা!" তার আহ্বানে লজ্জিত, অনুতপ্ত হলা পেকের আর এক রূপ ফুটে ওঠে। খোকাকে বুকে চেপে আশীর্বাদ করে কিন্তু আর সে সহজ গতি তার মধ্যে নেই। তিলুকে বলে–"তোমার পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই মুই। মরে গেলে মনে রাখবা তো দাদা বলে ?"

(*ইছামতী*, পৃ ১৬৭)। এখানে তার করুণ আর্তি হৃদয় স্পর্শ করে। অনুশোচনার আগুনে অপরাধের মার্জনা ঘটেছে।

নির্দয় ডাকাত হলা পেকের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রতর্কহীন। তার মুখে শোনা যায় শক্তিমতী এক নারীর কাহিনী। সে একবার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে গৃহকর্তার সাহসিকা পুত্রবধূর প্রতিরোধের সম্মুখে পড়ে। সড়কি হাতে দশাসই সুন্দরী মূর্তি দেখে দুর্ধর্ষ ডাকাত হলা পেকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হতবাক হয়ে যায়। তার ভাষ্যে অপূর্ব সে দেবীমূর্তির সড়কি নৈপুণ্য– "ব্যাকা করে খোঁচা মারে আর লাগলি নাড়ি-ভুঁড়ি নামিয়ে নেবে এমন হাতের ট্যার্চা তাক।" (পৃ ৪৭)। এভাবে উপন্যাসে বিম্বিত ব্রাত্য নারী চারিত্র্য–সৌকর্যে বীর্যবতী, বীরাঙ্গনার প্রতীক। বাগদি, দুলে মুচি, শুদ্দুরের মেয়েদেরও আছে অপরিমেয় সাহস ও নৈপুণ্য। হলা পেকে চরিত্রের আন্তর সম্পদ শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বীরত্বের মর্যাদাবোধ স্নেহপ্রবণতা চেতনা স্রোতঋদ্ধে অপূর্বলোকে উন্নীত করেছে। ঔপন্যাসিক অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যায় ডাকাত হলা পেকের মানস উন্মোচন ঘটিয়েছেন।

সংগ্রামী, প্রত্যয়ী যুবক লালমোহন পাল ওরফে নালুপালের সামাজিক মর্যাদায় উত্তরণ গল্প উপাদান প্রয়োগ প্রেক্ষণে সাযুজ্যপূর্ণ। পানের মোটবাহক নালুপাল একদা লালমুখো (শিপটন) সাহেবের আগমনে ভীত সন্ত্রস্ত, পলায়নপর। পরিণতিতে সেই শিপটন সাহেবের কুঠিবাংলোর মালিক নালুপালের বিত্ত–বৈভব বহুমাত্রিকে মণ্ডিত। দেব–দ্বিজে ভক্তি অসাধারণ। তাই যে কোন উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। প্রতিরাত্রে তার উপার্জন থেকে খেপী সন্ন্যাসীরা আশ্রমে ভক্তি-অর্ঘ্য হিসাবে আধলা পয়সা দিয়েছে। নালু যখন সফল ব্যবসায়ী, লালমোহন বাবু, তখনও সে নম্র, ভক্তি আপ্লুত। উচ্চবর্ণের নানামাত্রিক বিধিনিষেধেও উদ্ধত নয়। অব্রাহ্মণ্য ব্রাত্য শ্রেণী অর্থ–মর্যাদায় বড় হলেও ধর্মীয় অধিকারে সংকুচিত– এ দুঃশাসন ভেঙে দিয়েছে নালু পালের নীরব দ্রোহ চেতনা। ব্রাহ্মণ্য সমাজের সমালোচনা অগ্রাহ্য করে মহা ধুমধামে দুর্গা পূজা করেছে। পাশের গ্রামের বর্ণ হিন্দু তাকে স্বীকৃতি দিলেও , নিজ গ্রামের ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাকে ধিকৃত করেছে–"স্পদ্ধাডা বেড়ে গিয়েছে ব্যাটার। ব্যাটা হঠাৎ বড়লোক কিনা।" (পৃ ১৮২)। বর্ণ-বিত্তে বড় বলেই সব অধিকার কুক্ষিগত থাকবে এবং অব্রাহ্মণ্য ব্রাত্য শ্রেণীকে চিরদাস হয়ে থাকতে হবে এ অচলায়তন ভেঙে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বিভূতিভূষণের ব্রাত্যজীবন আর্থ–সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে মর্যাদাবান অহংবোধ উদ্দীপ্ত।

ইছামতী উপন্যাসে নালু পালের স্ত্রী তুলসী সহমর্মিতায় যোগ্য সহধর্মিণী। উচ্চ বর্ণের নারীদের প্রতি তার অকৃপণ দানহস্ত ও অকুণ্ঠ ভক্তিসমর্পণ। স্বগ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ নালুপালের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেও সমাজভুক্ত নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূ ও যতীনের স্ত্রী লুকিয়ে তুলসীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। কারণ, তুলসী নিরহংকারী, পরোপকারী। যতীনের স্ত্রী স্বর্ণ বলে–"তুলসীকে চটিয়ে লাভ নেই। আপদে-বিপদে তুলসী বরং দেখে, আর কেডা দেখবে?" (পৃ ১৮৬)। দারিদ্র্যের স্বার্থপরতা প্রসূত হলেও উচ্চ বর্ণের এ স্বীকৃতিতে বিভূতিভূষণের ব্রাত্যজীবন গৌরবান্বিত।

বিভূতিভূষণের নারী চরিত্র অনেকান্তে সম্প্রসারিত, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ও প্রজ্ঞাপ্রবিষ্ট। *ইছামতী* উপন্যাসে এমনই একটা নারী চরিত্র গয়া মেম। বরদা বাগদিনীর সুন্দরী মেয়ে গয়া। মৌল বক্তব্যের কাহিনী রসে স্বল্পমাত্রিক উপস্থিতি ঘটলেও চারিত্রের ঘনত্বায়ত অন্তর্গূঢ় ভাব-রসে সমৃদ্ধ। প্রেমে সেবায়, ভক্তি মমতায় সে শরৎচন্দ্রের বিলাসী।[১৫] বর্ণ আভিজাত্যহীন নীচু জাতের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও গয়া চারিত্র্য-মাধুর্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভবানীর দৃষ্টি প্রচ্ছন্নে এই সমাজ নিন্দিতা–"আর একটি শক্ত মেয়ে, জীবন সাধনার বড় অভিজ্ঞান ওর চরিত্র।" (পৃ ১৫৩)। গয়া মেম নীলকর শিপটন

সাহেবের অনুগৃহীতা, রক্ষিতা। পাপ পথে নামলেও সে নারীর হৃদয় ধর্মকে আজীবন বজায় রেখেছিল। সাহেবের ঋণ স্মরণে রেখে তার মৃত্যু পর্যন্ত অতন্দ্র সেবায় ঘিরে রেখেছে গয়া। মনের জোরে সহস্র প্রলোভন জয় করে, সমাজে পতিত হয়ে, সমাজের শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। গয়া মেম চরিত্রে অন্তর্দহন ও সমাজপীড়ন ঘন সন্নিবিষ্ট। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ মানুষের হৃদয় বোঝে না, বোঝে নিষ্ঠুর নিয়মসর্বস্ব প্রয়োজন। এই সমাজের পীড়িত আবর্তে এক ধরনের নির্লিপ্তি ও মমতা লক্ষ করি গয়া মেম চরিত্রে। সাহেবের রক্ষিতা হলেও তাকে সে ভালবেসেছিল ঐকান্তিক আন্তর প্রেরণায়। গভীর সে ভালবাসায় ছিল না প্রতারণার ফাঁদ, বিত্তের আকাঙ্ক্ষা। নিজে থেকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিছুই চেয়ে নেয় নি। প্রসন্ন আমিনের কৃপায় পেয়েছিল কয়েক কানি জমি।

গয়া মেম দ্বান্দ্বিক চরিত্র। সৃষ্টি অনুধ্যানে ঔপন্যাসিকের অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যা পরিলক্ষ্য। এ চরিত্রে যে সংকটের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে তা মানসিক ও সামাজিক সামূহিক বিপর্যয়ে অন্বিত। একদিকে সে খ্রিস্টান সাহেবের রক্ষিতা, সমাজে ঘৃণার পাত্রী। অপরদিকে স্বধর্মের মানুষের প্রতি তার অপরিমেয় মমত্ববোধ। দ্বৈত সত্তার মানসিক দৈন্যভার পীড়নে গয়া মেম ক্ষত-বিক্ষত,রক্তাক্ত। নারীধর্মে নিষ্ঠাবতী, করুণাময়ী গয়া মেমের কথায় কত লোকের নীলের দাগ মাফ হয়েছে, দণ্ড মওকুফ হয়েছে। কেউ স্বীকার না করলেও মানবিক প্রেরণায় আত্মতুষ্টির জন্য সে এসব করেছে। অশিক্ষিত গয়া মেমের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য সাংসারিক আবর্তন ছাড়িয়ে মনোলৌকিক শুদ্ধ জগতে প্রভাসিত।

গয়া মেমের ভালবাসার পবিত্রতায় নির্লোভ ব্রাহ্মণ রামকানাই পর্যন্ত হার মেনেছে। নীলকর নির্যাতিত দরিদ্র, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেবা করেছে গয়া, তার প্রতি মমতায় তাকে সাহায্য করার নানা ছুতো বের করেছে। গয়ার উপহার নিতে প্রথমে রামকানাই পণ্ডিত আপত্তি করেছে। শূদ্রের দান গ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব নয়–"ও নিতি পারবো না, আমি কারো দান নিই নে।" (পৃ ১১৮)। পরিশেষে, কন্যাস্নেহে আচ্ছন্ন পিতার মতো ব্রাহ্মণ রামকানাই পতিতা বাগদিনী গয়া মেমের সেবা, তার দেওয়া দুধ-কলা গ্রহণ করেছে। প্রসন্ন চক্রবর্তীর মতো সুযোগ সন্ধানীর স্নেহ লাভে সমর্থ গয়া মেম। প্রসন্ন আমিনের ভাষায়, গয়া "বড় ভাল মেয়ে এমন এ দিগরে দেখি নি।" (পৃ ২৫)। তার কুমতলব বুঝতে পেরেও গয়া উত্তেজিত হয় নি, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে স্বচ্ছন্দ হাসি–ঠাট্টাচ্ছলে বুঝিয়ে দিয়েছে, তা হবার নয়। খুড়োমশাই জ্ঞানে প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে কার্পণ্য করে নি। সাহেব মারা যাবার পর, আপন জনের মতো তাকে সুখ-দুঃখের কথা বলেছে। রামকনাই পণ্ডিতের দেওয়া 'কৃষ্ণের শতনাম' বইখানা প্রসন্ন আমিনকে দেখিয়ে বলেছে–" মাথার কাছে রেখে শুই।" (পৃ ১৬২)। স্বধর্মের প্রতি গয়া মেম নিষ্ঠাবতী, তা এ থেকে অনুধাবন করা যায়। সমাজ–ধর্ম তাকে ঠাঁই না দিলেও, ধর্মকে সে ছাড়ে নি।

বিদেশি বিজাতীয়, প্রয়াত সাহেবের প্রতি বিশ্বস্ত ভালবাসা গয়া মেমকে এমন এক বিশেষত্ব দিয়েছে যে, সামাজিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে সে সবার বিস্ময়ের পাত্রী। সে দ্বিচারিণী বা বহুগামিনী নয়। তার চিরদগ্ধ, বিরহী হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে সাহেবের অতীতের ভালবাসার সচ্ছল স্মৃতি রোমন্থন। নির্জন কুঠির পরিত্যক্ত অন্ধকার কবরখানায় বিস্ময়ে বজ্রাহত প্রসন্ন আমিন পাথরের মূর্তির মতো গয়া মেমকে আবিষ্কার করে। ত্রিলোকে কেউ মনে রাখে নি শিপটন সাহেবের মৃত্যুস্মৃতি, রেখেছে অন্তর্গূঢ় বেদনার বিরহিনী গয়া মেম। সে সন্ধ্যামালতী তুলে প্রসন্ন আমিনের হাতে দিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে– "দ্যান, ছড়িয়ে দ্যান। আজ মরবার তারিখ সায়েবের মনে আছে না ? কত নুনডা

খেয়েছেন এক সময়।" (পৃ ১৯৪)। অশ্রু পাথরে ভারী বেদনার প্রতিমূর্তি গয়া মেম এক ভিন্ন জগতে উত্তীর্ণ। সামাজিক বৈপরীত্যে ভালবাসার যন্ত্রণা, নিষিদ্ধ প্রেম, হৃদয়ের অব্যক্ত কান্নায় তাকে অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্ব, সমাজ-সংস্কার বৈধতার প্রশ্নাতীত মাধুর্য দান করেছে।

ইছামতী উপন্যাসে বিম্বিত ব্রাত্যজীবন নির্দিষ্ট কৌশলে আদর্শায়িত। ঔপন্যাসিক ঋদ্ধচেতনায় কলুষতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এই জীবনকে স্থাপন করেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অশনি সংকেত* (১৯৫৯) উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, উচ্চবর্ণ ও অব্রাহ্মণ্য ব্রাত্যজীবন মিলিত প্রবাহে অভাবে স্বভাবে সমন্বিত। বিভূতিভূষণ সৃষ্ট মানুষ প্রায়ই সময় সচেতন নয়, রাজনীতির অভিজ্ঞান তাদের নেই বললেই চলে। *পথের পাঁচালী-অপরাজিত* (১৯২৯-৩২) রচনাকালে দেশব্যাপী লবণ আন্দোলন তুঙ্গে, কিন্তু এসব কিছুই তাঁর উপন্যাসে তরঙ্গ তোলে নি। এ দিক থেকে *অশনি সংকেত* তাঁর সমগ্র সত্তার ব্যতিক্রমী স্বাক্ষর। নিদারুণ দুর্ভিক্ষের কালে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে *মাতৃভূমি* পত্রিকায় (১৩৫০-৫২) প্রকাশিত হতে থাকে। হঠাৎ কী কারণে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং পরে পুস্তকাকারে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।[১৬] নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচকগণ বিভূতিভূষণের সাহিত্য ধারায় এ উপন্যাসকে প্রক্ষিপ্ত বলেই গণ্য করেছেন। কিন্তু জীবনবাদী পাঠকের অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে *অশনি সংকেত* প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় না।

এ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সুখী ব্রাহ্মণ-কেন্দ্রিক কিছু মানুষ গ্রামবাংলার চিরায়ত পরিপার্শ্বিকতায় উদ্ভাসিত। নিস্তরঙ্গ গৃহস্থ জীবনে মানুষ হঠাৎ করেই প্রত্যক্ষ করে দুর্ভিক্ষের ভয়াল রূপ। বিংশ শতাব্দীর অধুনা নগর চৈতন্যে আরোপিত বলয়বিদ্ধ ভাবনায় আবহমান পল্লির নির্জন বাঁশতলা, জলমগ্ন পুকুর, ঝাটিবন, নীলকণ্ঠ পাখি ঔপন্যাসিকের মৌল ভাবনায় স্থাপিত। গ্রামজীবন সম্পৃক্তি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের প্রধান রীতি। *অশনি সংকেত*ও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। আবর্তিত ঘটনার মধ্যমণি চরিত্রদ্বয় অনঙ্গ বৌ ও গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী অভাবের তাড়নায় প্রথমে উন্মূলিত হয়ে আসে ভাতছালা গ্রামে। ব্রাত্য জীবন-সম্পৃক্তি ঘটেছে এ উপন্যাসে পারস্পরিক সহযোগিতায়। অনঙ্গ বৌদের ঘর ছিল গ্রামের বাগদি পাড়া থেকে অল্প দূরে পদ্মবিলের ধারে। পাশেই মুচিপাড়া। বাগদি ও মুচিপাড়ার বৌঝিদের সান্নিধ্যে মন্দ ছিল না তারা। একটা আন্তরিকতার যোগসূত্রও গড়ে, উঠেছিল অনঙ্গ বৌদের সাথে। কিন্তু পানির কষ্টে তারা অন্যত্র আবাস গড়ে সে গ্রামের নাম নতুন গাঁ। এখানে তারাই একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার। সবাই কাপালি, গোয়ালা প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণী। এদের বাড়িতে পূজা করেছে গঙ্গাচরণ, কিন্তু তাতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় নি। বরং অমূলক মনে হয়েছে অনঙ্গ বৌ-এর আশঙ্কা— "শুদ্দুর যাজক বামুন হলে লোকে বলবে কী।" *(অশনি সংকেত)*।

অন্য সব উপন্যাসের মত এ উপন্যাসেও বৃহৎ অনুষঙ্গে, বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে আছে ব্রাত্যজীবন। সে জীবনের সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম-সাফল্য উপর্যুক্ত বিন্যাসে লালিত। মুষ্টিমেয় উচ্চ বর্ণ, যারা অর্থবিত্তে দৈন্যভার পীড়িত, ধৈর্যশীল ও সাহায্যমুখী, তাদের পাশাপাশি মূল প্রেক্ষণ বিন্দুতে ব্রাত্যজীবন অত্যন্ত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক রেখায় অঙ্কিত। নতুন গাঁএ ভরন্ত সুখের দিনে অনঙ্গ বৌ যাদের স্মৃতিচারণায় আপ্লুত, তারা ভাতছালা গ্রামের গোয়াল পাড়া, মুচিপাড়ার বৌ-ঝি। এদেরই সাথে সাক্ষাতের জন্য অনঙ্গ বৌ ভাতছালা গ্রামে গিয়েছে। পরম আত্মীয়তায় আরো দেখা করতে এসেছে—কেউ দুধ, খেজুর গুড়ের পাটালি, কেউ বা পাকা মর্তমান কলা হাতে নিয়ে। পদ্মবিলের ধারে অনঙ্গ বৌ-এর পরিত্যক্ত ঘর মুহূর্তে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে মতি-মুচিনীর স্নেহহস্তের পরিমার্জনায়।

দরিদ্র, তুচ্ছ জীবনেও আছে ব্যক্তিত্ববোধ, লোকলজ্জা——এ উপলব্ধি বিভূতিভূষণের জীবনভাবনায় ব্যাপ্ত। দরিদ্র রায় জেলের বৌ দুর্ভিক্ষের দারুণ দৈন্যে ভোরবেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে কচুশাক সংগ্রহ করেছে উদর পূর্তির জন্য। চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত না হলেও অসচ্ছলতা, অভাবের তাড়না ইতঃপূর্বে পীড়িত করে নি তাদের। দুর্ভিক্ষের দৈন্যে মানুষ নিরুপায় হয়ে কত কিছু করে, তা বলে তার মর্যাদাবোধ থাকবে না——এমন হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব গণ্ডিতে মর্যাদার অধিকারী। রায় জেলের বৌও তার সাহজিক অহংবোধে অভাব-প্রসূত কচুশাক খাওয়ার লজ্জাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে চেয়েছে। নির্জন ঘাটে অনঙ্গ বৌ-এর কাছে ধরা পড়ে লজ্জিত জেলে-বৌ বিবৃত করেছে অভাবের ইতিহাস। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ অনাহারে থেকেছে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছে। দুর্ভিক্ষের প্রাথমিক ধাক্কায় মানুষ সে ভয়ংকর দিন কল্পনায় আনতে পারে নি, তাই রায় জেলের বৌ-এর চারিত্রিক সারল্য, উদ্ভূত নৈরাশ্যের হাহাকার ব্যথিত হৃদয়ের অশ্রু হয়ে ঝরেছে। লক্ষণীয়, অর্থনৈতিক দৈন্যভারজনিত তীব্র পীড়ন ক্লিষ্ট অনঙ্গ বৌ-এর হতাশার ভাষা ফলক এভাবে প্রকাশিত——"আহ, আমার ঘরে যদি চাল থাকত, আজ রায়ের বৌ আর তার ছেলেমেয়েকে না খাওয়ে থাকি?" (*অশনি সংকেত*)। ব্রাত্যদের প্রতি উচ্চ বর্ণের এমন সহজ মমত্ববোধ বিভূতিভূষণ ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারেন নি। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসগত জীবনচিত্র রূপায়ণে ও বিশ্লেষণে পরিলক্ষ্য, নিম্ন বর্ণের ছোঁয়াছুঁয়ি হলে উচ্চ বর্ণের খাবার ফেলতে হয়, অবেলায় স্নান করতে হয়।[১৭] বিভূতিভূষণের মানুষ সে সমাজ থেকে দূরের। তার মানুষ সুপ্রত্যক্ষ বাস্তব স্বভাব সমন্বিত।

অশনি সংকেতে ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে অনঙ্গ বৌকে নারীর মঙ্গলময় রূপে চিত্রিত করেছেন বলেই এত উজ্জ্বল। পাশাপাশি ব্রাত্য নারী সংগ্রামে সংকটে জীবন-রসে প্রোজ্জ্বল। অনঙ্গ বৌদের বিপাকে সাহায্য করেছে কাপালিদের ছোট বৌ, বিনোদ কাপালির বোন ভানু, মতিমুচিনী ব্রাত্যনারী। অর্থ-বিত্তে গরিব ওরা তবু মানবতার সহমর্মিতায় উদ্ভাসিত। সামাজিক ও আর্থিক বিনষ্টিতে চাপা পড়ে নি ওদের মন। নারীর চিরন্তন মমতাময়ী রূপে আবির্ভূত ভানু, শঙ্করপুরের নিবারণ ঘোষের বাড়ির বিধবা মেয়ে ক্ষেন্তমণি। রাধিকা নগরের হাটে চাল লুঠ হওয়ায় গঙ্গাচরণ সে রাতে চাল যোগাড় করতে পারে না। এ দুঃসময়ে ভানু বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্ষুদে গয়লার নাত বৌ-এর কাছ থেকে এক খুঁটি চাল চেয়ে-চিন্তে আনে। নিজের জন্য নয়——অন্যের জন্য এ কৃচ্ছ্রতা তাকে অনেক উপরে পৌঁছে দিয়েছে। দুঃসময়ের অসহনীয় দিনগুলিতে অন্নকষ্টের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে অনেকাংশে মুক্তি দিয়েছে ভানু।

যুদ্ধের অশুভ প্রভাব ও সামাজিক অবক্ষয়তা ছিনিয়ে নিল মানুষের সামূহিক মূল্যবোধ। যুদ্ধের ডামাডোলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে আবহমান বাংলার নিস্তরঙ্গ শান্তি বিনষ্ট, নীতিচ্যুত। নিরুদ্বেগ তলিয়ে গেল অনিশ্চিত হতাশায়। জীবনের জটিল বাস্তবতায় এবং মন্বন্তরে মানুষ দিশাহারা। সামাজিক দুষ্টক্ষতের মত, নীতি বিসর্জন দিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষ লুঠ করতে লাগল চালের গুদাম। এহেন দুঃসময়ে গঙ্গাচরণ শঙ্করপুরের নিবারণ ঘোষের বাড়িতে পেল নিজের খাওয়ার জন্য কিছু চাল ও আনাজ-পত, নিয়ে যেতে পারবে না এই শর্তে। ঘোষ বাড়িতে স্বপাক আহারের প্রাক্কালে নানা ব্যঞ্জনরঞ্জিত খাবার ক্ষুধার্ত গঙ্গাচরণের গলা দিয়ে নামতে চায় না। ক্ষুধা-ক্লিষ্ট অনঙ্গ বৌ-এর মুখটা স্মরণে এসে যায়। তাকে এ মানসিক যন্ত্রণা ও অসহায়ত্বের ক্ষোভ থেকে মুক্তি দিয়েছে ক্ষেন্তমণি। তাকে নিভৃতে, লুকিয়ে কিছু চাল দিয়ে শুভ কল্যাণবোধের প্রতিষ্ঠা করেছে। যে কল্যাণবোধ ভয়াল দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছায়াকে মানবিক আবেদনে ভাসিয়ে দেয়। গঙ্গাচরণের সকৃতজ্ঞ চাহনীতে সে হৃদয়

ধর্মের উচ্চাসনে ঠাঁই পেয়েছে। মানুষের আর্তির আশ্চর্য উদ্ভাসন ঘটেছে ক্ষেন্তমণির গোপন আন্তরিক বন্দোবস্তে। দয়াদাক্ষিণ্য ও চরিত্র-নৈপুণ্যে সে অসাধারণ।

দুর্ভিক্ষের উলঙ্গ বাস্তবতায় জনজীবন যখন সামূহিক বিপর্যয়ে নিঃশেষিত, তখন দুটি অন্নের বিনিময়ে কত বৌ-ঝি তাদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তেরশো পঞ্চাশের বর্ণিত মন্বন্তরে গ্রামবাংলার সেই পরিস্থিতিতে, এ উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত নারী চরিত্র কাপালিদের ছোট বৌ-এর সতীত্ব নষ্ট হয়। শোনা যায় তার আর্ত স্বর—"নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতে পাই।" (*অশনি সংকেত*)। অসহায়, দৈন্যশরবিদ্ধ,স্বীয় প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত কাপালি বৌ-এর চারিত্র্যগত অন্তর্লোক অনুধাবনযোগ্য। বিভূতিভূষণের শিল্প অভীপ্সা ও জীবনদৃষ্টি ভিন্ন ধরনের। তার ব্রাত্যজীবন বহুমাত্রায় শাণিত ও শীলিত। কাপালি বৌ চরিত্র অনুধ্যানে শিল্প-প্রকরণ প্রযোজ্য। অভাব মোচনে সাহসিকার মত বাস্তবতার মুখোমুখি, আবার কর্মচারিত্র্য বীক্ষণে শুভবোধ সচেতন। অনেকাংশে ধর্ম বিশ্বাস-প্রসূত। অসাধারণ মনের জোরে শহর-সম্পৃক্ত বিপথে যাত্রা স্থগিত করে কাপালি বৌ। অনঙ্গ বৌ-এর কথায় প্রাণিত হয়ে, যদু পোড়ার হাতছানি, প্রলোভন বিভ্রান্তি জয় করে। জাতে হীন হলেও হীনতাকে জয় করার প্রাণশক্তি কাপালি বৌ-কে মহিমান্বিত করেছে।

ব্রাত্যশ্রেণীর আর একটি চরিত্র আমাদের চেতনায় ঝড় তোলে—সে মতিমুচিনী। অনঙ্গ বৌ-এর সাহায্যকারিণী, পূর্ব পরিচিতা। ভাতছালা গ্রামে পদ্মবিলের অনতি দূরে মুচিপাড়ার বাসিন্দা। এ চরিত্রে ব্যক্তিত্ব, বিবেক বোধ, পরোপকারিতা ও বাস্তব সংকট সমবেতভাবে উত্তরণের প্রাণশক্তি পরিলক্ষ্য।

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের শোচনীয় অর্থনৈতিক সংকটের কঠিন-বাস্তব ছবি *অশনি-সংকেত*। এ উপন্যাসের ব্রাত্য চরিত্র মতিমুচিনীর চারিত্রিক বিকাশ মানসচৈতন্যের বিপর্যাস নিক্ষিপ্ত। দুর্ভিক্ষ কবলিত নিঃস্ব দিশাহারা মতি দুটি ভাত খাওয়ার আশায় বার বার ছুটে এসেছ অনঙ্গ বৌ-এর কাছে। ঘোরতর অভাবের দিনে অনঙ্গ বৌ অভাব জর্জরিত—সজ্ঞানে এ কথা জেনেও অবচেতনে আশান্বিত মতি ঘুরে ফিরে এসেছে। একদিকে প্রাণহারী ক্ষুধা, অন্যদিকে বিবেকবোধ—এই অন্তর্দহন মতি চরিত্রকে আলোকিত করেছে। এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া এ চরিত্রে অন্বিত। এই মানসজাত প্রতিক্রিয়া ব্রাহ্মণ দীনু ভট্টাচার্য কিংবা দুর্গা পণ্ডিতের চরিত্রে স্ফুরিত হয় নি। ক্ষুধার্ত, অনশনক্লিষ্ট অনঙ্গ বৌ-এর মুখের গ্রাসে তারা অম্লান বদনে উদর পূর্তি করেছে। পক্ষান্তরে, মতি সবসময় সংকুচিত, অনঙ্গ বৌ-এর গলগ্রহ হওয়ার কারণে। জঠর জ্বালায় জ্বলছে, তবু অসহায়তার গ্লানি, উপায়হীনের যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে!

মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষগুলোর গ্রামীণ স্বাতন্ত্র্যে জীবনযাত্রার একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ ছিল। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে তা বিচ্ছিন্ন। ভয়াবহ সংকটে মানুষ নিমজ্জমান। এ পরিস্থিতিতে অভাব থেকে পরিত্রাণের আশায় খাদ্য অনুসন্ধানে অনঙ্গ বৌ, মতি ও কাপালিদের ছোট বৌ অনতিদূরে জঙ্গলে যায়। গহীন বনে যখন তারা আলু তুলতে ব্যস্ত, সে নির্জন মুহূর্তে অভাবিতভাবে উপস্থিতি ঘটে এক লম্পটের। বিশাল বনপ্রান্তরে শ্রান্ত, ক্লান্ত তিনটি রমণী ভীতিবিহ্বল। সে সংকট মুহূর্তে নিজের অস্তিত্ব ও অনঙ্গ বৌ-এর সতীত্ব রক্ষায় মতির রণরঙ্গিনী মূর্তি ও দর্পী ভূমিকা বিমূর্ত রূপ লাভ করেছে।

দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে এক প্রকার অনাহারে, অসুস্থ অবস্থায় অনঙ্গ বৌ-এর আঙিনায় মতি মৃত্যুবরণ করেছে। তার মৃত্যুতে আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথায় কাতর অনঙ্গ বৌ-এর আন্তরিক অভীপ্সায় সৎকার হয়েছে। ব্রাহ্মণ দুর্গা পণ্ডিত ও কাপালিদের ছোট বৌ সহযোগিতা করেছে। অচ্ছুত বলে মতিকে ফেলে রাখে নি, বরং অনঙ্গ বৌ-এর বেদনার অশ্রুতে ভেসে গেছে সমস্ত অশুচিতা। সবার মনের

উপলব্ধিতে জাগে, এ পরিণতি তাদেরও হতে পারে। গঙ্গাচরণের বিস্ময় "না খেয়ে আবার লোকে মরে"— *(অশনি সংকেত)* বাস্তব রূপ লাভ করেছে। মতির মৃত্যু যেন অনাহারে মৃত্যুর প্রথম অশনি সংকেত। প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনার বাস্তবতা উপান্তে প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় পরিণত, ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ ব্রাত্য মতিকে নয়, একজন মানুষের অনাহারে মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলো।

এভাবে, সমালোচকের দৃষ্টিনিক্ষেপ ও আন্তর বিক্ষেপণে সহজেই প্রতীয়মান যে, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে রূপায়িত ব্রাত্যজীবন আর্থ-সামাজিক সংকট ও ধর্মীয়, সংকীর্ণতার আবর্তে পীড়িত হলেও সংঘাতে-সংগ্রামে, সৌহার্দ্য বিনিময়ে বর্ণ-বিত্তের সমান্তরাল। বেঁচে থাকার মূল প্রেরণায় সামগ্রিক চেতনাবাহী। *আরণ্যক, ইছামতী* ও *অশনি সংকেত* উপন্যাসে বিন্যস্ত ব্রাত্যজীবন নির্বিশেষ, সাহজিক, সঞ্চরণশীল। বর্ণ-বৈষম্যের অতীত মানুষ হিসাবে মানবিক সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশের স্বাধীনতা তাদের আছে। ব্রাত্য বলেই অচ্ছুত, পরিত্যাজ্য নয়। বিভূতিভূষণ আজীবন যা হতে চেয়েছিলেন, যা করতে চেয়েছিলেন তার সে আদর্শ, সে জীবনবোধ ও স্বপ্ন-বাস্তবতা উপন্যাসে ব্রাত্য চরিত্র নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে, এটাই বিভূতিভূষণের জীবনদর্শন।

তথ্যনির্দেশ

১. অর্ধেন্দু বিশ্বাস, 'প্রকৃতি চেতনা ও বিভূতিভূষণের গল্প', পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ,* প্রকাশক - মানস ভট্টাচার্য, ১৯৯২, কলিকাতা, পৃ ১৩০

২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প বিচিত্রা,* প্রকাশক-শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাঘ ১৩৬৪, কলিকাতা, পৃ ১১৩

৩. রাধারমণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র,* কে,পি বাগচী এ্যান্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ ১২

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১

৫. ঐ, পৃ ৫৯

৬. ডঃ অতুল সুর, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস,* শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড, নভেম্বর ১৯৭৬ (৮ম অধ্যায়, 'বাঙলার আদিসমাজ ও জাতিভেদের বিবর্তন'), পৃ ৩৭

৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১

৮. ঐ, পৃ ৪২

৯. শবর পাদানাম রচিত ২৮ নং পদ - উষ্ণা উষ্ণা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
কাহ্নপাদানাম রচিত ১১ নং পদ - কাহ্নে গাই তু কাম চণ্ডালী।
প্রাগুক্ত রচিত ১১ নং পদ - কাহ্ন কাপালী জোই পইঠ আচারে।
প্রাগুক্ত রচিত ১০ নং পদ - তু লো ডোম্বী হউ কাপালী।
-*চর্যাপদ* (বিশ্ববিদ্যালয় সংকলন)।

১০. ডঃ অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩

১১. কানন বিহারী গোস্বামী, 'অরণ্যের ঐক্যতান', পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ,* প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭ (বিভূতিভূষণের দিনলিপি, *স্মৃতির রেখা*- ১২.২.১৯২৮)

১৩. জহর সেন মজুমদার, 'আরণ্যক : গাঙ্গোতাদের জীবন', পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪

১৪. পম্পা মজুমদার, 'বিভূতিভূষণ ও ইছামতী,' পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১

১৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিলাসী', মুসলমান সাপুড়ে মেয়ে বিলাসী, মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রেমে-সেবায় অতুলনীয়, তবু সমাজে পতিত।

১৬. জোতির্ময় ঘোষ, 'বিভূতিভূষণ : সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতা', পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত *বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০

১৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীকান্ত*, *পল্লীসমাজ*।

সহায়ক গ্রন্থ

১. রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, কে, পি বাগচী এণ্ড কোং, কলিকাতা

২. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ,* প্রকাশক- মানস ভট্টাচার্য, ১৯৯২, কলিকাতা

৩. ডঃ অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, প্রকাশক : শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ডু, ১৯৭৬, কলিকাতা।

৪. নারায়ণ চৌধুরী, *সাহিত্য ও সমাজ মানস*, ১৩৬৯, কলিকাতা

৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ-১৩৬৪, কলিকাতা।

৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *আরণ্যক*, প্রথম অবসর প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৮, ঢাকা

৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইছামতী*, প্রথম অবসর প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৯৬, ঢাকা

৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অশনি সংকেত*